সমাজদর্শ ও রাষ্ট্রদর্শনের সম্পর্ক

Relation between Social Philosophy & Political Philosophy

সমাজতত্ত্বের সঙ্গে যেমন সমাজদর্শনের পার্থক্য আছে তেমনি রাষ্ট্রতত্ত্বের সাথে রাষ্ট্রদর্শনেরও অনুরূপ পার্থক্য আছে। তাই আমাদের উচিত কাজ হবে প্রথমে স্বল্প কথায় সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্ব বুঝে নেওয়া। তারপর সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের সম্পর্ক বুঝতে সুবিধা হবে।

সমাজের বিভিন্ন ঘটনা বা অবস্থার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে যে সব মতবাদের উদ্ভব হয়, তা হল সমাজতত্ত্ব বা সামাজিক মতবাদ। আর রাষ্ট্রের বিভিন্ন ঘটনা বা অবস্থার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে যে সব মতবাদ গড়ে ওঠে তা হল রাষ্ট্রতত্ত্ব বা রাজনৈতিক মতাবাদ। অভিজ্ঞতা নির্ভর বা তথ্যবাচক হওয়ার জন্য এই সব মতবাদ বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ। তাই আমরা এক্ষেত্রে বলতে পারি সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচ্য বিষয় হল বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক মতবাদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর আলোচ্য বিষয় হল বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক মতবাদ। বিভিন্ন সামাজিক মতবাদকে কেন্দ্র করে যেমন একাধিক সমাজবিজ্ঞান গড়ে ওঠে তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একাধিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান। আর এমনি ভাবেই সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

তবে অধ্যাপক র‍্যাফেল (Raphael) তাঁর Problem of Political Philosophy গ্রন্থে উপরে উল্লিখিত পার্থক্যকে যথাযোগ্য বলে মনে করেন না। র‍্যাফেলে মতে 'সমাজ' শব্দটি 'রাষ্ট্র' শব্দ অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক।। ব্যাপক অর্থে সামাজিক(Social) বলতে বোঝায় 'সমাজস্থ মানুষের সকল রকম ক্রিয়াকর্ম, যার মধ্যে রাজনৈতিক আচার-আচরণও অর্ন্তভুক্ত। কাজেই সামাজিক সংগঠন, যথা - পরিবার, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক সংগঠন যেমন সামাজিক তেমনি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংগঠনও সামাজিক। আর এসকল বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক একটি বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ। যেমন সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান। আর এ সকল বিজ্ঞানসম্মত মতবাদের লক্ষ্য হল, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীকে কোন এক বা একাধিক সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেওয়া।

প্রকৃতপক্ষে, পদ্ধতিগতভাবে সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে প্রাকৃত বিজ্ঞানের (Natural Sciences) যেমন ভৌত বিজ্ঞান কিংবা জীববিজ্ঞানের তেমন কোন পার্থক্য নেই। প্রাকৃত বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল বিশেষ বিশেষ ঘটনার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এমন এক সূত্র প্রণয়ন করা যার দ্বারা সেইসব বিশেষ বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে।

সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানও একইভাবে সমাজের মানুষের বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণের ওপর নির্ভর করে এমন কোন সূত্র প্রণয়ন করতে চায় যার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের ঐসকল আচার-আচরণকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বিষয়ের ব্যাখ্যায় সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিয়মগুলি জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের নিয়মের সমতুল্য না হলেও, তাদের প্রকল্প (HYpothesis)রূপে গ্রহণ করে, বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মতো, যাচাই করা সম্ভব হতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রকল্পকে পরীক্ষা-নীরিক্ষার দ্বারা যাচাই করে গ্রহণ অথবা বর্জন করা সম্ভব হতে পারে। অধ্যাপক র‍্যাফেলকে অনুসরণ করে আমরা এমনই দুটি প্রকল্পের দৃষ্টান্ত দিতে পারি। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে কার্ল মার্ক্সের একটি প্রকল্প যা হল - 'উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত শ্রেণী- দ্বন্দ্বই সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ।' তেমনি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি প্রকল্প - 'বহুদলীয় সরকার সল্পমেয়াদী হয়, দীর্ঘমেয়াদী হয় না।' বিজ্ঞানের প্রকল্পের মতো এসকল প্রকল্পও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নানারকম সামাজিক বা রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করে গঠন করা হয় এবং সে সকল প্রকল্পের মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানের প্রকল্পের মতো এসকল প্রকল্পও বস্তুনিষ্ঠ (Positive), পরীক্ষা-নীরিক্ষা নির্ভর।

তবে র‍্যাফেল বলেন, সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকল্পগুলি সৎ প্রকল্প(Good hypothesis) হলেও তারা কখনও প্রাকৃতবিজ্ঞানের প্রকল্পের সমমানের হতে পারে না। যেমন শ্রেণীদ্বন্দ্বকে সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তরূপে গ্রহণ করা গেলেও সমগ্র কারণরূপে গ্রহণ করা চলে না। তেমনি বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা মাত্রই যে অস্থায়ী ও স্বল্পমেয়াদী হবে - এমন বলার সপক্ষেও তেমন কোন জোরালো যুক্তি, সাক্ষ্য-প্রমাণ ইত্যাদি দেখানো যায় না। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, সমাজবিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি হল বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ, বিজ্ঞানীর মতো তাঁরাও কতকগুলি প্রকল্প গঠন করে সেই সকল প্রকল্পের মাধ্যমে সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন।

এখন আমাদের সময় হয়েছে উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝে নেওয়ার। বিজ্ঞানের সাথে যেমন দর্শনের সম্পর্ক, ঠিক তেমনিভাবে সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শনের সম্পর্ক। প্রত্যেক বিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ তথ্য বা ঘটনা পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে কতকগুলি নিয়ম বা মতবাদ প্রবর্তন করে, এবং সেই সব নিয়ম বা মতবাদের মাধ্যমে পর্যবেক্ষিত তথ্য বা ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করে। কাজে কাজেই বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল তথ্য বা ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান। কিন্তু দর্শনের লক্ষ্য ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান নয়, তার লক্ষ্য হল মতবাদের যৌক্তিকতা প্রদর্শন।

বিজ্ঞান মতবাদের বা নিয়মের সত্যাসত্য বিচার করে, দর্শন মতবাদের মূল্যায়ন করে অর্থাৎ ঘটনাটি ভালো না মন্দ, উপযোগী না অনুপযোগী, মঙ্গল না অমঙ্গলজনক তা নির্ধারণ করে। প্রচলিত অভিমত অনুসারে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল - বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ (Positive) -কারণ ঘটনা যেভাবে ঘটে সেটিই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অন্যদিকে দর্শন আদর্শনিষ্ঠ (Normative) - কারণ কোন আদর্শের(Norm) পরিপ্রেক্ষিতে মতবাদের বা তত্ত্বের আলোচনা করে। যদিও অধ্যাপক র‍্যাফেল শেষের এই পার্থক্যটিকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, বাস্তবকে অস্বীকার করে যখন আদর্শের উল্লেখ করা যায় না, তখন দর্শনের বস্তুনিষ্ঠ দিকটিকেও সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না। আদর্শের প্রেক্ষিতে যেমন তথ্য বা ঘটনার মূল্যায়ন করা হয়, তথ্য বা ঘটনার প্রেক্ষিতেও তেমনি আদর্শের মূল্যায়ন সম্ভব।

সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে দর্শনেরই দুটি শাখা বিশেষ - সমাজ বা রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাই হল সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শন। দর্শনের মতো সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শনের দুটি মুখ্য কাজ ঃ প্রথমটি হল বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রদর্শন এবং তার মূল্যায়ন, এবং দ্বিতীয়টি হল প্রত্যয়ের অর্থ স্পষ্টীকরণ। প্রথম কাজটি অপেক্ষাকৃতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বসের যৌক্তকতা বা মূল্যনির্ধারণ বলতে বিশ্বাসের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নিরূপণকে বোঝানো হয় না, বোঝায় বিশ্বাসের ভালো-মন্দ নিরূপণ, উপযোগিতা-অনুপযোগিতা নিরূপণ, ন্যায্যতা-অন্যায্যতা নিরূপণ।

প্রচলিত কোন সামাজিক বিশ্বাসের বা মতবাদের সাথে যখন নবাগত কোন বিশ্বাসের বা মতবাদের বিরোধ দেখা দেয় তখন সমাজদর্শ বা রাষ্ট্রদর্শনের কাজ হল বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের পাস্পরিক ভালো-মন্দ, উপযোগিতা-অনুপযোগিতা বিচার করে তাদের একটি বিশ্বাসকে গ্রহণ করে অন্যটিকে বাতিল করা, অথবা দুটি বিশ্বাসকেই কিছুটা পরিমার্জন করে এক সমন্বিত ও উন্নত বিশ্বাসে উপনীত হওয়া। যেমন, বিভিন্ন দেশে নৈতিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখে সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শন সেসব ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান-ধারণার মধ্যে, বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক, তাদের কোন একটিকে যথাযোগ্যরূপে গ্রহণ করে; অথবা তাদের কয়েকটির পরিমার্জনপূর্বক সমন্বিত করে এক ব্যাপকতর উন্নত ও অপেক্ষাকৃত উপযোগী ধারণাকে গ্রহণ করে।

দর্শনের মতো সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শনও আদর্শনিষ্ঠ (Normative)। যেমন ন্যায়ের বা কল্যাণের আদর্শের উল্লেখ করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল্যায়ন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা প্লেটো (Plato) তাঁর রিপাবলিক (Republic) গ্রন্থে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার উল্লেখ করতে পারি। রিপাবলিক গ্রন্থে প্লেটো এক আদর্শ গণরাজ্যের চিত্র অঙ্কন করে সেই আদর্শের মানদণ্ডে তৎকালীন গ্রীসের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল্যায়ন করেছেন। তবে আদর্শনিষ্ঠ দর্শনে বাস্তব দিকটিকে যেমন সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা যায় না, ঠিক তেমনি আদর্শনিষ্ঠ সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শনেও বাস্তব দিকটিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা যায় না।

রিপাবলিক গ্রন্থে প্লেটো যে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার চিত্র অঙ্কিত করেছেন, সেখানে তাঁর লক্ষ্য হল - সেই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন বাস্তব সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করা। অর্থাৎ প্লেটো তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থে কেবল আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের চিত্রই অঙ্কিত করেন নি, পরন্তু সেই আদর্শের বিচারে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অসঙ্গতিরও উল্লেখ করেছেন এবং সাথে সাথে সেই আদর্শের যথাসম্ভব বাস্তবায়নের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। প্রকৃত কথা হল সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শন মূলত আদর্শনিষ্ঠ হলেও সেখানে সমাজের বা রাষ্ট্রের বাস্তব দিকটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয় নি।

দর্শনের মতো সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শনের দ্বিতীয় লক্ষ্য হল, প্রত্যয়ের অর্থ স্পষ্টীকরণ। জড়, মন, দেশ, কাল প্রভৃতি অতিব্যাপক প্রত্যয়গুলি স্পষ্টার্থক নয় বলে তাদের কেন্দ্র করে দর্শনে নানা সমস্যা দেখা দেয় এবং সেসব সমস্যা সমাধানের জন্য দর্শন ঐ সব প্রত্যয়ের বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক সঠিক অর্থটি নির্ধারণ করতে চায়। আর এইভাবে সমাজ, কর্তৃত্ব, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলি স্পষ্টার্থক নয় বলে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে তাদের কেন্দ্র করে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য এদুটি দর্শনে ঐসব প্রত্যয়ের সঠিক অর্থ যে কি, তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। সমাজদার্শনিক যখন সমাজের উল্লেখ করেন তখন প্রথমেই 'সমাজ' শব্দটির সঠিক অর্থ কি তা নির্ধারণ করতে প্রয়াসী হন; তেমনি রাষ্ট্রদর্শনিক যখন 'গণতন্ত্রের' আলোচনা করেন তখন তাঁর লক্ষ্য হল, প্রত্যয়টির সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা এবং প্রচলিত প্রত্যয়টির উৎকর্ষসাধন করে তাকে যুগপযোগী করা।

উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য করা গেলেও সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। 'সমাজ' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে রাষ্ট্রকেও সমাজের অর্ন্তগত একটি সংঘ বা প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র সংক্রান্ত একাধিক আলোচনাকে সমাজসংক্রান্ত দার্শনিক আলোচনা থেকে ভিন্ন করা যায় না। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন দর্শনেরই শাখা এবং দর্শনের শাখারূপে তাদের আলোচনা পদ্ধতি ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হতে পারে না। রাজনৈতিক আলোচনাকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজের আলোচনা সম্ভব নয়, তেমনি সামাজিক আলোচনাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের দার্শনিক আলোচনাও সম্ভব নয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ